ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 405- 417
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.223

যদুবংশ: বিভ্রান্ত সময়ের যাপিত যৌবন

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, *সহকারী অধ্যাপক, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bimal Kar wrote the novel *Yaduvansha*, set in a turbulent period in the 20th century; this work is a culmination of the love, frustration, conflict and vacillation of the youth of the sixties. The intricate characters actually reflect the multifaceted voices of that time. Despite the negativity, the characters cannot be denied, but rather a sense of compassion is aroused towards them. Bimal Kar's presentation makes the reader empathize with those characters.

Keywords: Bimal kar, *Yaduvansha,* The sixties in Bengal, Emerging youth, Love and lovelessness, Positivity

১

মহাভারতে যদুবংশের বিনাশ হয়েছিল মুষলপর্বে। গান্ধারীর অভিশাপের আড়ালে সেই ঘটনার প্রাকৃত কারণ ছিল ভিন্ন; যাদবদের অভ্যন্তরীণ 'তুচ্ছ কলহ' পরিণত হয়েছিল 'ঘোরতর আত্মযুদ্ধে'। *পাঞ্চজন্য* উপন্যাসে গজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছিলেন—

> "তাঁর নিজের বংশের এ পরিণাম তিনি জানতেন, এতটা জানতেন না। নারী ও সুরায় উন্মত্ত হয়ে উঠল তারা। সর্বজনসমক্ষে সর্বক্ষণ সুরাপান করতে লাগল। আহোরাত্র সুরাপান, মাংসাহার ও স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক যৌনসম্ভোগে রত রইল। শ্রদ্ধেয়দের অবজ্ঞা করতে লাগল, যা শুভ ও হিতকর তা উপেক্ষা করল। শুধু তাদের দেহটাই নয়— মনে হল তাদের আত্মা-মনও নানাবিধ পাপ ও ব্যসনে ডুবে গেছে, তা থেকে উঠে আসার আর কোন আশা নেই।"[১]

কৃষ্ণ বা বলরামের প্রয়াণের পর যদুবংশের মহিলাদের উদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং অর্জুন। কৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নী, পৌত্র বজ্র, যাদবংশের বহু নারী এবং বৃদ্ধদের নিয়ে পার্থ যাত্রা করেছিলেন দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে। কিন্তু সময়ের মার সেই কাজের অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল। পঞ্চনদ প্রদেশের কাছে গিয়ে যখন তারা পৌঁছয়—

> "সেখানকার আভীর দস্যুগণ যাদবনারীদের দেখে লুব্ধ হয়ে যষ্টি নিয়ে আক্রমণ করলে। অর্জুন ঈষৎ হাস্য করে তাদের বললেন, যদি বাঁচতে চাও তো দূর হও, নতুবা আমার শরে ছিন্ন হয়ে সকলে মরবে। দস্যুগণ নিবৃত্ত হল না দেখে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব নিলেন এবং অতি কষ্টে জ্যা রোপন করলেন, কিন্তু কোনও দিব্যাস্ত্র স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি এবং সহগামী যোদ্ধারা বাধা দেবার চেষ্টা করলেও দস্যুরা নারী হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারী স্বেচ্ছায় তাদের কাছে গেল। অর্জুনের বাণ নিঃশেষ হলে তিনি ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন, কিন্তু সেই ম্লেচ্ছ দস্যুগণ তাঁর সমক্ষেই বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় সুন্দরীদের হরণ করে নিয়ে গেল।"[২]

মহাভারতের এই ঘটনার মিথকেই উপন্যাসের নামকরণে ব্যবহার করে বিশ শতকের ছয়ের দশকের বিভ্রান্ত যুবসমাজের ছবি আঁকলেন বিমল কর তাঁর *যদুবংশ*-এ। এই প্রসঙ্গে লেখক নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> "যদুবংশের ধ্বংস হয়েছিল নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেই। সেভাবেই তো এরা নিজেদের নষ্ট করেছে। সব দিক থেকে তারা অধঃপতিত হয়ে গিয়েছিল— সোসালি এবং পলিটিক্যালি। কৃষ্ণের পায়ে একটা তির এসে বিঁধল ওটা গল্প, আসলে নিজেদের ভিতরেই তারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।"[৩]

যদুবংশ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ছ'য়ের দশক। আমরা যদি সেই কালপটভূমির দিকে তাকাই, তাহলে চোখে পড়বে, ছ'য়ের দশক সূচনার প্রাক্‌লগ্নেই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে খাদ্য আন্দোলন— এরই সঙ্গে হরতাল এবং আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বহু মানুষ; ভুখা মিছিল ও ময়দানে কৃষক সমাবেশ। চলে আসে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং ভাষা আন্দোলন। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে। শুরু হয় ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ— অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-চীন যুদ্ধের কারণে কমিউনিস্ট পার্টিতে যেমন বিভাজন ঘটে, অন্যদিকে শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ১৯৬৭ সালে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিম-বাংলার বিধানসভায় জাতীয় কংগ্রেসের বদলে প্রথম সরকার গঠন করেছে যুক্তফ্রন্ট। সাহিত্যে আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল হাংরি আন্দোলন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিও প্রস্তুত। মোটামুটি এই রকম সময়ে লিখছেন বিমল কর তাঁর *যদুবংশ* উপন্যাস। এই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্লটে মফঃস্বল অঞ্চলের কয়েকটি ছেলের বিভ্রান্ত যাপনের বাস্তব ছবিই তুলে ধরেছিলেন ঔপন্যাসিক। বিমল করের কথাসাহিত্যের প্রয়োগশৈলীর আলোচনা প্রসঙ্গে সুমনা দাস সুর লিখেছিলেন—

> "স্বাধীনতা উত্তরকালে পঞ্চাশের দশকের বিভ্রান্ত সময়ে, স্বপ্নভঙ্গের কালপর্বে একদিকে ভঙ্গিসর্বস্বতা, অন্যদিকে পলিটিক্যাল সিনিসিজম্-এর দিকে ঝোঁক দেখা দেয় যখন মাঝারি মানের লেখকদের মধ্যে, তখন বাঙলা কথাসাহিত্যে হাল ধরেন দুজন প্রতিভাবান লেখক— একদিকে সমরেশ বসু অন্যদিকে বিমল কর। পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরীর নামও স্মরণীয়। তীব্র, তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতা, অভিজ্ঞ শল্যবিদ্-এর দক্ষতায় বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ব্যবচ্ছেদ করে অন্তর্গত কোনো সত্যের নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশনায় সমরেশ বসু অসামান্য।... এর বিপরীতে বিমল কর তাঁর গল্প উপন্যাসে সম্পূর্ণ এক অন্যভুবন গড়ে তোলেন। অবশ্য বিমল কর বাস্তব সচেতন নন এমন কথা ভাবা ভুল, বরং তিনি গভীরতর অর্থে সংবেদনশীল। তবে শীতের ভোরের কুয়াশার মতো তাঁর কাহিনি এবং চরিত্রদের ঘিরে থাকে এক মিস্টিক রোমান্টিক বলয়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে ডানা মেলে দার্শনিক উপলব্ধির আকাশে। বিমল করের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি কখনোই চিৎকৃত আত্মঘোষণায় উন্মুখ নয়; বরং তাঁর হার্দ্য, মরমী কণ্ঠস্বর; সরল অনাড়ম্বর বাচনভঙ্গি কখনো কখনো ছলনা করে পাঠককে। একমাত্র মনযোগী পাঠেই বোঝা যায় জীবনকে আতস কাঁচের তলায় ফেলে দেখার কী সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শাণিত আঙ্গিক সচেতনতা আত্মগোপন করে আছে তাঁর আপাত সহজ রচনাগুলির গভীরে।"[৪]

আলোচ্য *যদুবংশ* উপন্যাস সম্পর্কেও এই বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

২

উপন্যাসটির সূচনা বর্ষার প্রেক্ষাপটে— কালপটভূমি দীর্ঘ নয়, শরতেই উপন্যাসের সমাপ্তি। এরই মাঝে সময়ের স্বর ও পথভ্রষ্ট যুবসমাজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। পাশাপাশি সমাজ এবং রাজনীতিকেও উপেক্ষা করেননি লেখক। নয়নাদের বাড়ি ও তাঁর আশপাশের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানাচ্ছেন— 'পাড়াটা ছোট, বাসিন্দারাও অতি সাধারণ। দু-পাঁচটা একতলা পাকাবাড়ি, কায়ক্লেশে খাড়া করা কয়েকটা মাঠকোঠা, বাকি কিছু বস্তি ধরনের বাড়ি। পাড়ার আশেপাশে এখনও ঝোপঝাড়, ডোবা, এবড়ো-খেবড়ো জমি, মরচে-ধরা ভাঙা টিনের বেড়া দেওয়া কাঠগুদাম। শহরের বিজলিবাতি গলি পর্যন্ত এসেছে, ঘরদোরে যায়নি। এই কাঁচা রাস্তাতে আলো আসার কথা ছিল না, নিতান্ত সূর্যর বাবা কামাখ্যাবাবু, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। ভোটের আগে সদলবলে ডুবতে ডুবতে কথা দিয়েছিলেন রাস্তার পিচ আর আলো, আর নালি-নর্দমা সাফের ব্যবস্থা করে দেব, সেই দেওয়া কথা রাখতে গোটা চারেক ফালতু পুরানো পোস্ট এনে এদিকে বসিয়ে দিয়েছেন; কাঁচা ব্যবস্থায় কটা বাতিও মাথার ওপর ঝোলে। মাসের

মধ্যে পাঁচ-সাতদিন হয়তো দুএকটা বাতি জ্বলে, বাকি জ্বলে না।' রাজনীতির কৌশলী রূপের পাশাপাশি আছে ব্যর্থ যৌবনের বিকৃত প্রতিক্রিয়া। তাই বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে গভীর রাতে রাস্তার বাল্‌ব গুলতি দিয়ে মেরে ফাটিয়ে দেয় সূর্য। এই বিদ্রোহ শুধু আলোর বিরুদ্ধেই নয়, কীটদ্রষ্ট এবং মূল্যবোধের অবনমন ঘটা সমাজের বিরুদ্ধেও। তবে সেই যুবকদের আচরণ ও যাপন, সবই সেই ভ্রান্ত জীবনবোধের কেন্দ্রে।

বাংলা উপন্যাসকোশ গ্রন্থে *যদুবংশ* উপন্যাসের পরিচয়ে এরকম লেখা হয়েছে—

> "উপন্যাসের নায়ক গণনাথ, তাকে কেন্দ্র করে সমকালের বেকার যুবকদের চিত্র এঁকেছেন লেখক। মফঃস্বল শহরের এই যুবকেরা হল দারোগার ছেলে বুললি, পিতৃহীন কৃপাময়, বেকার অভয় ও মাতৃহীন সূর্য— এই চারজন। স্বাধীনতা পাবার পরে বিশ বছর কেটে গেছে, নিভে গেছে সাধারণ মানুষের সব আশার আলো, দেশের রাজনীতিতে ক্রিমিনালাইজেশন প্রবল হয়ে উঠেছে। গণনাথ এদের মধ্যে এক আশ্চর্য জীবনের, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত জীবনাচরণের ও সত্যের প্রতীক চরিত্র, যে বিবেকের তীব্র তাড়নায় আফিং খেয়ে আত্মহনন করে, তাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যায় সবাই। বেকার, একান্ত সাধারণ, পরোপকারী গণনাথ হয়ে ওঠে অবক্ষয়িত যুগের বিবেক।"[৫]

শুধু গণনাথ বা গণাদা-ই নয়, তার বিপ্রতীপে অবস্থান করছে যে চরিত্রগুলো, তারাও স্পষ্ট করে দেয় যুগের অবক্ষয়ের স্বরূপ। সবচেয়ে বড় কথা গণনাথকে কেন্দ্র করে যে চারটি চরিত্রের বিকাশ, তাদের আত্মক্ষয়ের কারণ কেবল 'সামাজিক, পারিবারিক ও পরিবেশগত কারণেই ঘটে না— ব্যক্তিগত মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বেদনার কারণে ঘটে থাকে'— একথাও স্বীকার করে নিতে হয়।

৩

চারটি চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই যার পরিচয় দিতে হয়, সে সূর্য— মাতৃহীন এই যুবকের পরিবার বলতে বিপত্নীক পিতা, বিধবা দিদি ও দুটি ভাগ্নে। আপাতভাবে মাতৃহীন ভায়ের কাছে বড় দিদি তো মাতৃসমা হয়ে ওঠে, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি দেখি। বিজয়া ও সূর্যর একেবারে অহিনকুল সম্পর্ক, সেখানে স্নেহ-মমতার লেশ মাত্র নেই, হিংসা-দ্বেষ এবং এবং পারস্পরিক আক্রমণ চলে অনুক্ষণ। দিদির সাজপোশাকও সহ্য করতে পারে না সূর্য— 'জামাইবাবু বেঁচে থাকার সময়েও দিদি মাথায় কাপড় দিত না। বাপের বাড়িতেই আজন্ম কাটল। বিয়ের পরও, হয়ত তাই। এই বাড়িটা দিদির বাপের বাড়ি, তার স্বামী সেই বাড়িতেই থেকে গেল বলে যেন দিদি তার বাপের বাড়ির কর্তৃত্ব ও অধিকার বরাবরই দেখিয়ে গেছে।' দিদিও ভাইকে 'হারামজাদা', 'ছোটলোক','অসভ্য', 'জানোয়ার'— কিছু বলতেই বাকি রাখে না। তাই দিদির মধ্যে স্নেহশীলা মূর্তি নয়, বরং বিজয়ার ঘন ভুরু, কপালের খাঁজ, পুরু ঠোঁট আর তাতে লালচে বাসি দাগ বিরক্তি জাগায় সূর্যর মনে। দিদিকে মনে মনে 'খচড়ি মাগী' বা 'কুত্তি' বলতে পারে সে।

সূর্য দেখেছে তার, দিদির এবং বাবার- তিনজনের চোখের তলায় কালচে দাগ- অবশ্য মৃত মায়ের চোখের তলায় যেমন দাগ ছিল কিনা সে মনে করতে পারে না। মা তার কাছে স্বপ্নের মত- ছেলের স্বপ্নে মা তো আসেনও। হয়ত সময়ের এই সঙ্কট থেকে মনে মনে সূর্য মুক্তি পেতে চায় মা কে কল্পনা করে। একসময় তার জীবনেও তো ছিল প্রাণময় কৈশোর, সজীব প্রেম- একদিন সন্ধের পর- ভয়ঙ্কর শীতে, মেলায় টিনের সিনেমাঘরে যখন 'দেবদাস' দেখানো হচ্ছে, 'সূর্য আর সুমি- দুই ভলেন্টিয়ারসূর্যের গরম কোটের তলায় মাথা ঢেকে কোটের দুটো লম্বা হাতা দুজনের দুপাশে কানের মতন ঝুলিয়ে 'দেবদাস' দেখছিল। দেখতে দেখতে বিশ্বসংসার ভুলে গিয়েছিল সে, মনেও ছিল না মেয়েদের দিকে একটা কাঠের সরু বেঞ্চিতে বসে আছে। বই শেষ হয়ে যাওয়ার পর সুমি চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'তোর কোটের ঝাপটা লেগে আমা চোখ কেটে গেছে', জবাবে সূর্য বলেছিল; 'তোর চুলের ক্লিপে আমার খোঁচা লেগেছে চোখে'। তারপর 'এ ওকে মিথ্যুক বলল, ও অন্যকে 'মিথ্যুক' বলল। তারপর ভিড়ের মধ্যে দুজন দুজনকে ধরে হারিয়ে গেল'।

এছাড়াও সূর্যের আরেকটি স্নেহের জায়গা আছে- দিদির ছোট ছেলে ছোকনু। পোলিওর কারণে সে একটা পা টেনে চলে। ছোকনুর অবস্থা দেখে সূর্য দিদির ওপরেই ক্ষেপে যায়- 'দিদি বরাবর অনেক লটপট করেছে, করে যাচ্ছে। এত পাপ শালা ভগবান সইবে কেন? কিন্তু বেচারি ছোকনুর কপালেই ...' পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে- 'সে যখন মরে যাবে তখন, এই বাড়ি টাড়ি, টাকা-পয়সা, যেখানে যা কিছু থাকবে তার থাকবে, সব ছোকনুকে দিয়ে যাবে। শুধু ছোকনুকে।' অবশ্য ছোকনুর দাদাটিকে সূর্য সহ্য করতে পারে না। তার চোখ মুখ, হাবভাব কথা বলার ভঙ্গি সবকিছুই

বিজয়ার মতো- ভাগ্নের 'রোয়াব' দেখে 'একদিন একটা লাথি মেরেছিল সূর্য, ছিটকে গিয়ে বাগানে পড়েছিলো হারামজাদা'। ছোকনুর প্রতি আছে তার মায়া, ছলাফেরা নিয়ে সাবধান ও করে বালকটিকে। খেলনা বন্দুক তাক করেও খেলাছলে গুলি ছুড়তে পারে না সূর্য— মনে হয় 'সাহেবদের কবর খানার মাথায় পোঁতা ছোট্ট ক্রুশের মতো দাঁড়িয়ে আছে ছোকনু'।

মা যেমন সূর্যর কাছে স্বপ্ন, তেমনি তার হিংস্রতার অন্তরায় হয়ে এসেও দাঁড়ায়। বাবার অবস্থান সূর্যের জীবনে একেবারে ভিন্ন। শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই এতটুকু— বাবার কাজকর্মের সরাসরি সমালোচনা না করলেও, সেসবের প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। যদিও মন্দ কাজের সমালোচনা করা বা নীতির প্রশ্ন তোলার মতো নৈতিকতার ধার ধারে না সূর্য। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে ভোটে দাঁড়ালে, বাবার বিরুদ্ধে যখন বিরোধীদল খোল-করতাল বাজিয়ে ছড়া গেয়ে যায়, তখন সূর্যর হাসি পায়; ঘৃণাও জাগে— যখন মনে পড়ে রাস্তার শৌচালয়ে বাবার বিরুদ্ধে সাঁটা পোস্টারের কথা। সে ভাবে— 'এ শহরে বাবার সুনাম কিছু নেই। রাস্তায়, ঘাটে, দোকানে লোকে গালাগাল দেয়। বাবার ওপর লোকের কী আক্রোশ ও ঘেন্না। তবু বাবা জিতে যায়, বাবার সম্মান মর্যাদা টিকে থাকে। কী আশ্চর্য।' সূর্যের মনে কিন্তু ঘৃণা আছে, আর তাই অভয় তাকে 'দিলদারের বাচ্চা' বললে সে ক্ষেপে ওঠে। অথচ সূর্যকে অনুভূতিহীন বলা যায় না। নিজের ঘরের আসবাবপত্র দেখতে দেখতে তাই তার মনে হয়— 'এত জিনিসের সঙ্গে তার প্রয়োজনের শেষ নেই, বাড়ির জিনিস বাড়িতে থাকবে'। নিজেকেও তার ওই অপ্রয়োজনীয় আসবাবগুলোর মতোই মনে হয়েছে 'তাকেও যেন রেখে দেওয়া হয়েছে'।

বুললির পারিবারিক প্রেক্ষাপট বেশ গোছানো— যেখানে আছে স্বচ্ছলতা। বাবা পুলিশের দারোগা, মা-ও আছেন। দাদা চাকরির কাজে বাইরে, বউদি অবশ্য শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবরের সঙ্গেই থাকছে। কিন্তু পারিবারিক শান্তি সেখানেও অনুপস্থিত; শাশুড়ি ও পুত্রবধূর নিত্যকলহ। এসবের অবশ্য একটু পূর্বইতিহাসও আছে। বুললির দাদা সাধন, মৃদুলাকে বিয়ে করেছিল বাড়ির অমতে। মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বুললির বাবা এই বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ বিয়ের আগেই সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছিল মৃদুলা— 'কিন্তু যার জন্য এত, সেই খোঁড়া গর্তটাই বুজে গেল। বউদির পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল কিছুদিন পরেই।' এই ঘটনাটা ইচ্ছাকৃত কিনা বুললি জানে না। যদিও এই গর্ভপাতের বিষয়টি বুললির মা বিশ্বাস করে না, আর 'বিশ্বাস করে না বলেই মা'র সন্দেহ এবং রাগ আরও বেশি বউদির ওপর। ঘেন্নাও। যে জীবহত্যা করেছে তাকে মা কিছুতেই সুনজরে দেখবে না।' যার ফল 'নিত্য ঝগড়া, রোজই মার মুখ গম্ভীর, প্রত্যহ মা ছেলের বউকে খেঁতলাচ্ছে।'শুধু এই নয়, আরও গূঢ় কারণ ঢাকা পড়ে আছে— মৃদুলার স্বামী ছেড়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকার ভিন্ন হেতুও খুঁজে পেয়েছে বুললি। চাকরিতে বাবার অবসর নেবার সময় হয়েছে— মাস কয়েক পরেই প্রচুর টাকা আসবে তাঁর হাতে। নিজেদের জন্য বাড়িও তৈরি হবে। সাধন এসব বুঝেই বউকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবা মায়ের কাছে, পাছে হকের জিনিস হাতছাড়া না হয়। দাদার মানসিকতা উপলব্ধি করেছে বুললি- 'অন্তত চোখের সামনে বউদি থাকলে বাবা বা মা তাদের বাড়ির অন্য ভাগীদারকে মনে না করে পারবে না।' প্রথমদিকে শাশুড়ির অনুগত হয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই 'আদিখ্যেতা' ধরে ফেলতে দেরি হয়নি বুললির মায়ের— 'শত হলেও গুহমশাইয়ের স্ত্রী, দারোগার গিন্নি, ওসব চোরের মন সহজেই বুঝতে পারে।'

উপন্যাস থেকে জানা যায়, বাকি তিন বন্ধু এবং তুলসী স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হলেও, বুললি কলেজে গেছে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। তাই বি.এ. পাশ বউদির 'চালিয়াতি' আর বাপের বাড়ি সম্পর্কে 'বড় বড় কথা' একেবারেই সহ্য করতে পারেনি। বরং সে লক্ষ্য করেছে— 'বউদি ঠিক যখন তাকে সভ্যতার লেকচার মারছে তখন নিজেই বুক থেকে আঁচল খসিয়ে বসে ব্লাউজের বোতাম নখ দিয়ে খুঁটছে, বা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, পা দুটো হাঁটু থেকে তোলা, পায়ের কাপড় গড়িয়ে পড়েছে।' তবুও দেবর-বউদির মধ্যে সখ্যও ছিল, কিন্তু 'সভ্যতা-ভদ্রতা' নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বুললি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি, মুখের ওপর বড় বউদিকে বলে ফেলেছে—

- 'ভদ্রলোকের বাড়ির বি.এ. পড়া ছুঁড়ি তো নই গো, শিখব কোত্থেকে।'
- 'তোমার বাপের বাড়ির ভদ্দরলোকেরা তো নিজের মেয়ে বোনকে রাস্তায় ছেড়ে লেলায়। যেমন তোমায় লেলিয়েছিল।'

সূর্য যেমন দিদির মুখে শুনেছিল, বুললিকেও তার বউদি বলেছে— 'ছোটলোক। লোচ্চা, লোফার কোথাকার'। অবশ্য বুললিও চুপ থাকেনি, বড় বউদির গায়ে হাত না তুললেও 'এক থাপ্পড়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব' কিংবা 'শালা বেজন্মার বংশ' বলেই ফেলে।

মোটামুটি মেয়েদের প্রতি ষাটের বিভ্রান্ত যুবসমাজের মানসিকতা ধরা পড়ে বুললির আচরণে। বউদির তোয়ালে, বালিসের ওয়াড়, রুমাল, গেঞ্জিগুকাতে দেওয়া 'দেখতে দেখতে সে হাতের পাম্প অন্যমনস্কভাবে চাপছিল, খুলছিল, আবার চাপছিল'। বুললির মেজাজ 'খিঁচড়ে' থাকার প্রসঙ্গে সূর্যও একবার বলেছে— 'সেই দেখেছিলি নাকি?' নয়নাদের বাড়িতে গণনাথের থাকার প্রসঙ্গেও বুললি বলেছে— 'তিন তিনটে ছুঁড়ি নিয়ে বাড়ি করে বসে আছে। আমাদের একটা করে দিক না মাইরি।' অথবা যমুনা সম্পর্কে— 'মেজকিটার খুব টোল আছে' অথবা গণনাথের ওপর চড়াও হবার দিনে নয়নার 'বেয়াড়া বুকে' চোখ পড়েছে তার। লুক স্টোর্সে গিয়েও সূর্য বা বুললির চোখ পড়ে মেয়েদের অন্তর্বাসে। সূর্য অশ্লীল শারীরিক ইঙ্গিত করে বলেছে— 'ওই যে রবারের বাটি, তোর বিয়েতে তোর বয়কে ওই একজোড়া প্রেজেন্ট করবো'। সেইসব জিনিসে চোখ বুলিয়ে বুললির দীর্ঘশ্বাস— 'মেয়েদের এত কিসিমের আছে মাইরি, আমাদের শালা কিছু নেই'। ভারী চেহারার মাদ্রাজি মহিলা টিকিট কালেক্টরকে দেখে অভয়ের সঙ্গে বুললির কদর্য রসিকতা— 'ও হাসে কী করে মাইরি, ওপন হয় কী করে?'

এই উদ্ধত রাগী বুললিও সম্পূর্ণ মমত্বহীন নয়। তাই যখন অভয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে বিষয়টা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যা যায়, ঠিক তখনই অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে বুললি— 'উটের মতো গলা বাড়িয়ে অভয়ের গালের পাশে নাক বরাবর শব্দ করে একটা চুমু খেল। তারপর হেসে বলল, 'শালার মান হয়েছে, লে রে কিস দিয়ে দিলুম, মান ফান মুছে ফেল! চল!...' বুললির সারল্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে অভয়ের সূত্রে, তেমনই তার প্রেমিক সত্তার প্রকাশ অভয়ের বোন আভাকে কেন্দ্র করে। সবার অলক্ষ্যে 'দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একেবারে আচমকাই আভার পিঠ জড়িয়ে কাছে টেনে নিল, নিয়ে টপ করে একটা চুমু খেয়ে ফেলল। চুমু খাবার পর সরে এসে নিজের ঠোঁট চুষতে চুষতে কেমন হয়ে গেল। ভীষণ একটা আবেগ যেন মুখে।'— আপাতভাবে মনে হতেই পারে এ তার অবদমিত কামের তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ, অন্তত বুললির আচরণের গতিপ্রকৃতি সেই ইঙ্গিতই দেয়। আভার সঙ্গে তার গভীর প্রেমের অবকাশ লেখক দেখাননি; কিন্তু বুললির অর্থহীন জীবনও যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে যখন সে লুক স্টোর্সে যায় অন্তর্বাস দেখতে বা অশ্লীল বই কেনার উদ্দেশ্যে নয়, আভার জন্য সোয়েটারের ডিজাইনের বই কিনতে। উপন্যাসের শেষে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় অভয় এবং অন্যান্যদের সামনে সরাসরি নিজের ভালোবাসার কথা স্বীকারও করে।

বুললি বা সূর্যর থেকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার অভয়— এই অভিমান কেবল নিজের মধ্যে পুষে রাখেনি, তার বিভিন্ন কথা ও আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন অর্থনৈতিক সংকট যুবসমাজের মেরুদণ্ড কিভাবে ভেঙে দিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে অভয় চরিত্রের পরিকল্পনায়। 'জেনারেশন গ্যাপ'-এর ছবিও ধরা পড়েছে অভয়ের বক্তব্যে— 'আমার বাবা মাইরি এ সংসারে মা ছাড়া কাউকে জানে না। চাকরি করে আর ঘুমোয়। যা কিছু বলা-টলার সব মা'র সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাই হয় না বড় একটা।' এই দূরত্বের কথা বুললিও স্বীকার করেছে। বাকিদের অবস্থাও একই। অভয়ের মা তো সূর্যের মায়ের মত স্বপ্ন নয়, তাই সংসার ও সন্তানদের প্রতি তিতিবিরক্ত হয়ে সকালবেলাই বেকার ছেলের উদ্দেশে বলে দেয়— 'লজ্জা করে না তোদের, একটা মানুষ আগুনের আঁচে রক্ত শুকিয়ে পয়সা আনছে আর তোরা খাচ্ছিস-দাচ্ছিস ঘুরে বেড়াচ্ছিস। নেমকহারাম নচ্ছার কোথাকার। এসব শুয়োরের জাত আবার মানুষ পেটে ধরে। মরগে যা—।' দিদি-বউদি-মা, সম্পর্ক যাই হোক, তাদের ব্যবহার মোটামুটি একই রকম, কোনো স্নেহ-মমত্বের অবকাশ নেই সেখানে। অথচ এই অভয়ের মা, বুললি-সূর্য বা কৃপাময়ের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ বজায় রেখে মিষ্টিমুখ করায়। অথচ ছেলে সামান্য সাইকেল সারানোর জন্য টাকা চাইলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, রোজগারের খোঁটা দেয়।

এই পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়া অভয় চরিত্রে দীনতার সঙ্গে যুক্ত করে আক্রোশ— তাই কখনো সূর্য বা কখনো বুললির সঙ্গে সংঘাত ঘটে। অর্থনৈতিক অসাম্য নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয় নিজের মনে। বার বার তার চোখে পড়ে 'ওদের বাপের মর্যাদা আর টাকার গরম'। আবার এই রাগ সরিয়ে বন্ধুদের ভালোওবাসে। তবে— 'সূর্য আর বুললির চেয়ে কৃপাময়কে আরও বেশি নিজের বলে মনে হয়। দুঃখের সময় কৃপাময় তার যত আপন, সূর্যরা তত নয়। আবার এও সত্যি, সূর্য বা বুললির অভাব তার পক্ষে অসহ্য। না, চা সিগারেট বা মালের জন্য নয়, মমতার জন্য, বন্ধুত্বের জন্য'। এই সাহচর্য

তার একান্ত কাঙ্ক্ষিত, না হলে তার নিজের সাথী বলতে তো সেই 'হাড়গোড় ভেঙে যাওয়া মানুষের মতো' সাইকেলটা। চাকরির জন্য চারু দত্তের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। এই সব প্রত্যাখ্যান আর অপমানে ভরা জীবনে চলতে গিয়ে অসামাজিক কাজ করে ফেলে সে, কখনো সিদ্ধি খেয়ে যমুনার গালে ঠোনা মেরে মেয়েদের বিষ নজরে পড়ে, কখনো স্টেশন চত্বরে কোনো মেয়েকে দেখে শিস দিয়ে গণাদার থাপ্পড় খায়।

চার বন্ধুর মধ্যে অনুভবী মন কৃপাময়ের— সে কিছুটা শান্ত-স্থিতধী। অনেক উত্তপ্ত পরিস্থিতি তার মধ্যস্ততায় স্বাভাবিক হয়েছে। কৃপাময়ের পারিবারিক অবস্থাও খুব স্বাভাবিক নয়। তার বিধবা মা বদ্ধ পাগল— 'ঘরে শিকল দিয়ে রাখতে হয়'। মায়ের এই পরিণতির কারণ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল কৃপাময়। পারিবারিক আভিজাত্যের আড়ালে যে কত সংকীর্ণতা লুকানো আছে তা সে বোঝে— বোঝে 'নোংরামি' আর 'নিষ্ঠুরতা'— 'মাকে ওরাই পাগল করেছে। ঠাকুমা, বাবা, কাকারা, পিসিরা। মা'র সর্বস্ব ওরা শুষে নিয়ে, মার শেষ সম্বল স্বামীটিকে গলা পর্যন্ত সংসারের নোংরা মাটিতে পুঁতে দিয়ে দেখিয়েছে মা কত অসহায়।' নিঃস্ব রিক্ত সেই মহিলা শেষ আশ্রয় নিয়েছিল ধর্মকর্মে, যা তাঁকে পরিণত করেছে মানসিক প্রতিবন্ধীতে। অন্যদিকে 'তার ছেলে এই সংসারে আবর্জনার মতো বেড়ে উঠতে লাগল'। কৃপাময়ের অবস্থা বাড়ির অবৈধ সন্তানের মতো। তার দিদির বিয়ে হয়েছিল আগেই, সেখান থেকে কিছুটা স্নেহ পেয়েছিল বটে, কিন্তু দিদিও মারা গেছে অকালে।

নিঃসঙ্গ কৃপাময় অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে হাহাকার করে কাঁদে আর দেখে বাড়ির মানুষদের স্বার্থপরতা— সে জানে, 'এ বাড়ির ভিত, দেওয়াল, কড়িবরগা আর পুরানো যত আসবাবপত্র আচার-বিচার— সমস্ত কিছুর মধ্যে বাইরে বাইরে একটা শোভা আছে, ভার আছে, পুরানো গন্ধ আছে; নয়তো আর কিছু নেই। বাবাকে এরা যন্ত্রণা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রতারণা করে মেরেছে। এরা কেউ স্বার্থপর, কেউ অকৃতজ্ঞ, কেউ অর্থপিশাচ, চরিত্রহীন, কেউ সাবধানী, সতর্ক, শঠ।' অথচ সে দেখেছে খুড়তুতো ভাই দিব্যেন্দু কলেজের ক্যান্টিনে বন্ধুদের সঙ্গে চা-ডিম খেতে খেতে বাড়ির জন্য নিজের বাবার 'কন্ট্রিবিউশন'-এর গল্প শোনায়; অসুস্থ জ্যেঠিমা সম্পর্কে মিথ্যে বলতেও তার বাধে না। দিব্যেন্দুর বোন বীথি 'চুপ শয়তান', বাইরে মনে হবে তার শিক্ষা-দীক্ষা উপচে পড়ছে, অথচ কৃপাময় নিজের চোখে তাকে যেমন ছোটকাকীমার দেরাজ থেকে টাকা চুরি করতে দেখেছে,তেমনই দেখে অন্ধকারে সিঁড়ির তলায় 'মামাতো ভাইয়ের আদর খেতে'।

পরিবারে কৃপার প্রতি একমাত্র যে সদয়, তার ছোটকাকীমা, ছোটকাকার দ্বিতীয় পত্নী প্রতিমা। প্রথম পক্ষের সুন্দরী-অহংকারী স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়ে সন্দেহজনকভাবে মারা যায়। দ্বিতীয়-স্ত্রীকে ছোটকাকার পছন্দ হয়নি— 'কোত্থেকে একটা কালো মুখ্যু মেয়েকে জোগাড় করে এনেছিস? আমাদের বাড়িতে এসব রাস্তার ভিখারি মানায় না।' সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার স্পষ্ট প্রকাশ আছে এই নারীভাবনায়। তবে কৃপাময় বোঝে— 'ছোটকাকার বউ-টউ তেমন দরকার ছিল না, মেয়েছেলের দরকার ছিল মাঝেমাঝে; সেই দরকারটা ছোটকাকা বাইরে থেকে মিটিয়ে আসে তা আজকাল বোঝা যায়। মদ-টদও বেশ খায়। আর টাকা টাকা করে ছোটকাকা পাগল। ওকালতি করছে, ট্যাকসি কিনে ভাড়া খাটাচ্ছে, বেনামা জমি কিনে কিনে রাখছে। টাকার নোংরায় গলা ডুবিয়ে বসে আছে কাকা।' দাম্পত্য জীবনে প্রতিমার এই শূন্যতা তাকে কৃপাময়ের কিছুটা কাছে এনে দিয়েছে। দুজনের বয়সের পার্থক্যও খুব বেশি নয়, সম্পর্কের মধ্যেও আছে স্বাচ্ছন্দ্য। এমনকি দেওঘরে দীক্ষা নিতে যাবার জন্য প্রতিমা সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছে কৃপাময়কেই। 'কৃপাময়ের ব্যাঙ্ক'-ও ছোটকাকিমা, প্রতিমাই তাকে হাতখরচা যোগায়। অবশ্য প্রতিমা নিজেই কোনোদিন এই পথ বন্ধ করে দেবে, এই ভেবে কৃপা আগেই নিজেকে 'অ্যালুফ' করে নিয়েছে, তার মনে হয়েছে— 'নিজের তো কেউ না, কাকী। আজ ভাল মুখ করছে কাল খারাপ মুখ করতে পারে। কী দরকার।' সংসারে পড়ে আছে কৃপা শুধু আসুস্থ মায়ের জন্যই, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে তারও মুক্তি এই পরিবার থেকে।

৪

বিমল কর ও সমকালীন ঔপন্যাসিকদের প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—

> "... ভারসাম্যের বিচলন, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ জীবনবোধের অবসান, অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা, বিপর্যয়ের বিজয়, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বাংলার অর্থনৈতিক রাজনীতি মহিমার অবসান; এই পটভূমিতে আলোচ্যমান উপন্যাস লেখকেরা চোখ মেলে তাকিয়েছেন, দেখেছেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি, অবাক মেনেছেন ভাগ্যের পদাঘাতে নৈরাশ্যের লগুড়াঘাতে।"[৬]

এই ভাবনা বিমল করের *যদুবংশ*উপন্যাসের পরতে পরতে মিশে আছে। যুগের অবক্ষয় এবং তার মূর্ত রূপ— চার চরিত্রের মাঝে আদর্শ ও বিবেকের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলে গণনাথ। সামাজিক সম্মান, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং শারীরিক সুস্থতা— কিছুমাত্র তার নেই। অন্যের আশ্রয়ে সে বাস করছে। রুজি-রোজগার প্রায় বন্ধ। অথচ জীবন তো সে এইভাবে শুরু করেনি; অভয়ের বক্তব্য থেকে জানা যায়— '... স্কুলে পড়ার সময় থেকে গণাদার কী প্রশংসা শুনেছি। কাজের ছেলে, ভালো ছেলে, পরোপকারী ছেলে। সেই ছেলে মাইরি কী মাতব্বর হয়ে উঠল। আমাদের এনিথিং লিডার গণাদা।' কিন্তু নিজে আত্মসুখী হতে পারেনি বলেই 'এক কথায়' পাওয়া রেলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল গণনাথ। দেশের স্বাধীনতা নিয়েও ভাবনা চিন্তা ছিল, তাই পরাধীন দেশে শাসকের চাকরি করতে চায়নি। মানুষটার মধ্যে আছে এক শান্ত ও সমাহিতভাব— গায়ের রঙ মাঝারি, চোখ-নাক বড়, মাথার কোঁচকানো চুল রুক্ষ— 'চোখের দৃষ্টি এবং হাসি দুই-ই কেমন শান্তশিষ্ট, মোলায়েম।'

পেটে আলসার— মেসবাড়ি ছেড়ে থাকছে নয়নাদের বাড়িতে। তিন বোনের সংসারে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো গণনাথের অবস্থানকে লোকে দেখে কুঞ্চিত কটাক্ষে। এই চার বন্ধুর দল প্রথমদিকে আকার ইঙ্গিতে আভাস দিলেও পরে স্পষ্টভাবেই অসম্মান করেছে গণাদাকে। গণাদা নিজেও বোঝে একসময় ছেলেগুলো তাকে ভালোবাসলেও, পরিস্থিতির বদল ঘটেছে- 'সেই সম্মানের ও ভালোবাসার সামান্য অবশিষ্ট আছে হয়ত'। গণনাথও বদলেছে, তবু নিজের আদর্শবোধ থেকে সরে যেতে পারেনি। সূর্য নিজের বাড়ির সোনার পঞ্চপ্রদীপ তাকে বিক্রী করতে দিলেও, বাড়ির সেই ঐতিহ্যকে সে বিক্রী করতে পারে না গণনাথ। নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সূর্যকে একসময় প্রদীপটি ফিরিয়ে দেবে ভেবেছিল। এই প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বিমল কর জানিয়েছেন—

> "...যদুবংশে একটা পঞ্চপ্রদীপ ছিল যেটা ওল্ড ভ্যালুজ-এর প্রতীক। ছেলেগুলো সেটা জানতো না। অবশ্য তখনও পর্যন্ত ওরা টোটালি ডেস্ট্রয়েড হয়নি। কিছু গুড সেন্স তখনও ওদের মধ্যে কাজ করছিল। সেই জন্যই গণনাথকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় সূর্য কাঁদছে— বলছে, আমরা তোমাকে মারিনি গণাদা। তাদের মধ্যে শুভ কোন চেতনা তখনো ছিল।"[৭]

গণাদা এই শুভ চেতনারই প্রতীক— তাই যমুনা চরিত্রের নানা ত্রুটি দেখেও প্যারাটাইফয়েড থেকে সেরে ওঠার পরেও অর্থিকভাবে বিপর্যস্থ মানুষটা তার পথ্যির ত্রুটি রাখে না। নয়নার সঙ্গে তার এক অদ্ভুত সহজ-সম্পর্ক, ঠাট্টা করে নয়নাকে 'বড়দি' বলে গণনাথ। আবার গননাথই নয়নাকে যৌবনে একসময় বাঁচিয়েছিল যখন সে গণনাথেরই মেসের একটি ছেলের সঙ্গে 'কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি'-র ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল। বহুদিন পরে অসুস্থ গণনাথকে নয়না নিজের বাড়িতে রাখতে চাইলে, আপত্তি করেনি সে— কারণ তার কাছে জীবন অনেক বড়। হয়ও সেও পাপকেই ঘৃণা করে, পাপীকে নয়। তাই নয়না যখন নিজের বোন যমুনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মসুখী মানসিকতার কথা বলে, গননাথের উত্তর— 'সুখের মুখ দেখার আশাসবাই করে নয়না। সংসারের এটাই নিয়ম। যমুনার নিজের একটা আশা থাকতে পারে। তাতে দোষের কী?'

বিমল করের *দংশন* উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে শচীন দাশ লিখেছেন—

> "... সময় ও সমাজকে বাদ দিয়ে যে উপন্যাসের আখ্যান তৈরি সম্ভব নয়, এ তত্ত্ব বিমলদা নিজেও বিশ্বাস করতেন। ফলে সময় ও সমাজের বহির্বাস্তবতা তার মননেও ছায়া ফেলেছে। কিন্তু ফেললেও তিনি যেহেতু আদ্যোপ্রান্ত একজন আত্মমুখী মননের কারবারী সেহেতু বহির্বাস্তবের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও জটিলতাই তাঁর সাহিত্যে বড় বেশি আশ্রয় নিয়েছে। এবং যতটা সেখানে মন ও মননের দ্বন্দ্ব ও জটিল-আবর্ত থাকে ততটা আর বাইরের ঘটনাপ্রবাহ সেখানে তোলে না।"[৮]

সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে লেখার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট যোগ প্রসঙ্গে বিমল কর নিজেও *দেওয়াল* ও *যদুবংশ* উপন্যাসের উল্লেখ করেছিলেন। এই সমকালীন রোগজর্জর সময়ের মাঝে শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও প্রাণপণ সুস্থ চেতনাকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে গণনাথ। অকপট এই চরিত্র নিজের কোনো দুর্বলতাকে আড়াল করেনি। উদ্ধত চার যুবকের সামনে স্বীকার করেছে— 'আমার সেই শ্রীবৎস রাজার অবস্থা, শনিতে ধরেছে'। তবুও সূর্যর দেওয়া প্রদীপ বিক্রী করেনি, কিন্তু শনির প্রকোপ এড়াবে কী করে! যমুনা সেই জন্মসুখী প্রদীপ বেচে নিজের সুখের সন্ধানে চলে গেছে, আর গণাদা মার খেয়েছে উন্মত্ত সূর্যদ-বুললির হাতে। শেষ পর্যন্ত মিথ্যে চুরির দায়ে নির্মম অপমানের ভার আর সহ্য করতে পারেনি, আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সে।

গণনাথকে আক্রমণ করলেও, অপরাধবোধ থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় উদ্দেশ্যহীনভাবে। অভয়, গণনাথের আত্মহত্যার খবর নিয়ে এলে, সূর্য মনে মনে কেবলই এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করেছে। এমনও ভেবেছে— 'গণাদার যেরকম হাল হয়ে এসেছিল, তার ওপর তিন তিনটে মাগী সামলানো, তাতে আফিং টাফিং হয়ত চালাচ্ছিল গণাদা, তারপর বাড়িতে তিন তিনটের সঙ্গে নিশ্চয় লড়ালড়ি হয়েছে; রাগের মাথায় বেশি খেয়ে ফেলেছে; ফেলে একেবারে খালাস হয়ে গেছে।' কিন্তু নিজের দায়কে তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেনি সূর্য— 'গণাদা তাদের জন্যই আফিং খেল না তো!... মনে পড়ার পরেই সূর্য মাথা নাড়ল, না— না, তাদের জন্য কেন খাবে!' অপরাধবোধ কিংবা গণাদার প্রতি চাপা পড়া ভালোবাসা তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল শ্মশানে। গণাদার মৃতদেহ চারবন্ধুর কাঁধে— তখনও তাদের মনে চার বন্ধুর আর্তি— 'গণাদা আফিং খেয়েছে। কেন শালা, আফিং কেন? ... আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করলে তুমি! কেন? প্লে করলে?'— এভাবেই বুকফাটা 'ছেলেমানুষি কান্না গোঙাতে গোঙাতে বেরিয়ে এল'।

৫

যদুবংশ উপন্যাসের প্রকাশ ১৯৬৮। ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাস থেকে পরের বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল রমাপদ চৌধুরীর *এখনই*। দুটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট প্রায় এক— তাই একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে চলে আসে আরেকটি উপন্যাস। দুটি উপন্যাসই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তপন সিংহের পরিচালনায় 'এখনই' মুক্তি পায় ১৯৭১ সালে; তিন বছর পরে পার্থপ্রতিম চৌধুরী নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র 'যদুবংশ'। দুটি উপন্যাসে যুবসমাজের 'অন্তর্দহন' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "তারা এক সুরে বেজে উঠলেও বিষণ্ণতা অথবা অন্য কোন ভাবনার তরঙ্গ ভেসে যেতে থাকে, লীন হয়ে যেতে থাকে একাকীত্বে। সমাজ তাদের অধঃপতন-বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ি হলেও আত্মধ্বংসের দায়ভার রয়ে যায়। তাদের নিষ্ক্রিয়তা, পরিস্থিতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, গণনাথের সঙ্গে তীব্র বিবাদে লিপ্ত হয়ে গণনাথকে প্রহার— নষ্ট সময়ের চিহ্নায়কগুলিকে ধারণ করে তারা হয়ে ওঠে যদুবংশ— এভাবেই মহাভারতের যদুবংশের অনুষঙ্গকে জীবনোপলব্ধির গভীরতায় সমকালীন তাৎপর্যে গেঁথে নেন বিমল কর। যদুবংশ-এ একদিকে প্রদীপকে ঘিরে গড়ে তোলা পুরানো তথা ঐতিহ্যের প্রতি নির্বোধ তাৎপর্যহীনতাকে প্রকটিত করে শেষপর্যন্ত বোধের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন ইঙ্গিতে-দ্যোতনায়। উপন্যাসটিতে অনুপুঙ্খ-বর্ণনা যুবকদলের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতাকে প্রকাশ করেছে এবং এগুলোই তাঁদের বেঁচে থাকার আশ্রয় হয়ে উঠেছে।"[৯]

এই সংবেদনশীলতাকে চিনিয়ে দেবার জন্যই বোধহয় লেখক তুলসী চরিত্রটিকে নিয়ে এসেছেন। পিনকির দেশী মদের ঠেকের চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান সূর্যদের এককালের সহপাঠী তুলসীর। পড়াশোনা, আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ— সবদিক থেকেই চার যুবকের চেয়ে বিপরীতে তার অবস্থান। তবুও অসহায়-অসুস্থ তুলসীর কাছে ছুটে যায় চারজনেই, কিন্তু এও বোঝে— 'তুলসীটার আলাদা রাস্তা... ওর রাস্তা এটা নয়'।

একলা রুগ্ন শরীর নিয়ে রাস্তা হাঁটে তুলসী— শরীর ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। তবু তার মধ্যে আছে আত্মসম্মান। বাবার উদাসীনতা আর সৎমায়ের অবহেলা ছেড়ে নিজেই এককামরা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারও খেয়েছে সে। তুলসীর শান্ত-সংযত আচরণকে সূর্য যতই 'মাগিগিরি' বলুক, ছেলেটির গুণগুলোকে অস্বীকার করতে পারে না। তুলসীর ওপর অন্যায় আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে সূর্য-বুললি বেপরোয়া হয়ে ওঠে, আবার তারা শান্ত হবার পর তুলসীও মিশে যায় তাদের সঙ্গে— 'দড়ির খাটিয়ায় পাঁচজন গায়ে গায়ে, এ ওর পিঠ, ও এর পেটে হেলে ঝুঁকে শুয়ে বসে আছে... খুব ঘনিষ্ট, অন্তরঙ্গ, গভীর হয়ে পাঁচ বন্ধু জড়াজড়ি করে বিছানায় বসে, দড়ির খাটিয়াটা ঝুলে গেছে।'

তুলসী পড়াশোনায় ভালো, বি.এসসি পাশ করে শহরে পড়াশোনা করতেও গিয়েছিল। তুলসীর অভিজ্ঞতার সূত্রে লেখক নগর জীবনের কপটতাকে তুলে ধরেছেন। 'বাংলাদেশে ওরকম কবি আর জন্মায়নি'— তেমনই এক ব্যক্তিকে অসহায় তুলসী পঁচিশ টাকা ধার দিয়েছিল বিপদের সময়, দুবছর পার করেও সেই টাকা আর ফেরৎ আসে না। এই টাকা দিয়ে তৈরি হয় শরীর, শরীরের জেল্লা আর চরিত্র— 'বিলেতি মাল খাওয়ালে একরকম হয়, দিশি খাওয়ালে একরকম হয়, কবিতা গল্প ছেপে দিয়ে একরকম হয়, বেশ্যাবাড়ি নিয়ে গেলেও।' ক্ষেত্র বিশেষে এবং স্বার্থ অনুযায়ী একই মানুষের কণ্ঠস্বর যায় বদলে— 'কোনও পুরানো নামকরা কবির বাড়ি গেলে গলার ভয়েস হিজ মাস্টার্স ভয়েস,

সাহিত্যিকের দাদার কাছে গেলে, মাইরি বলছি, একেবারে তেলাতেলা, কবিতা পাঠ করার সময় নাদ ওঠে, মালখানায় রিয়েল ভয়েস, মেয়েদের কাছে বাটা শু...' তুলসীর বক্তব্য থেকেই সাহিত্য-জগতে 'হিপোক্রেসি'র চরম উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। যেখানে গ্রামের ছেলে নিজের কবিতার বই প্রকাশের আনন্দে মদের দোকানে ১২২টাকা খরচ করে 'সেলিব্রেট' করে 'মদের দোকানে বসে নবীন কবি যত প্রশস্তি পেল তার কয়েক টুকরো যদি সত্যি হত তবে ওই কবি ক্ষণজন্মা পুরুষ বলতে হবে'। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে সেই স্তাবকবৃন্দের ভাষায় প্রশস্তি তো দূরে থাক, শালীনতার মাত্রাও সেখানে থাকে না। তুলসীর মনে হয়েছিল— 'ওরা আড়ালে পরস্পরকে কুকুরের মতো কামড়াবে, দল বাঁধতে পারলে ঘেউ ঘেউ করে, একে অন্যের কুৎসা রটায়, প্রশস্তি গাইবার জন্য ভাড়াতে গাইয়ে রাখে।' এদের কাছ থেকে সরে, নিজের স্বপ্ন মুছে ফিরে গিয়েছিল নিজের রোহভূমিতে, হয়ত এইসব কপটতা দেখে সূর্য-বুললি-অভয়-কৃপাময়কে অনেক স্বাভাবিক মনে হয়েছিল তার।

তুলসী বিশেষ মেধাবী না হলেও পড়াশোনার প্রতি ছিল তীব্র আগ্রহ। ইচ্ছে ছিল 'অ্যাস্ট্রোনমি' নিয়ে পড়াশোনায়। সেই উদ্দেশ্যে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে কলকাতায় গেলেও আবার ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু সেই তুলসীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে সামান্য টিউশনিও জোটে না— প্রাইভেট টিউটরের ক্যারেকটার সার্টিফিকেটের পাশাপাশি হেলথ-সার্টিফিকেটও দাবি করে গার্জেন। পরিবার-পরিজনের কাছেও সে প্রায় অপাংক্তেয়। তবু ষষ্ঠীর দিন 'নতুন মা'-র জন্য সামান্য শাড়ি কিনে বাড়ির পথে যায়— সামান্য কিছু দেওয়ার এই কর্তব্যটুকু সে অস্বীকার করতে পারে না— যা দেখে কৃপাময়ের মনে একই সঙ্গে আনন্দ-বেদনা-মমতা জেগে উঠেছিল। তুলসীর প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমনা দাস সুর লিখেছেন—

> "তুলসী ফিরে আসে তার নিজের জায়গায়। কিন্তু সূর্যদের দলের একজন হয়ে যায় না। কেননা একদিকে ঘৃণা ও অন্যদিকে ঔদাসীন্যের মাঝে এই যুবকদের যে নিষ্ক্রিয় টিকে থাকা— সে পথ তুলসীর নয়। পরিবারের সান্নিধ্য থেকে সরে এলেও সে নিজেই নিজের খুঁটিতে বাঁধা। এই অস্থির সময়ে অবক্ষয়িত সমাজে বাস করেও সে স্বপ্নভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট নয়... তুলসীর জন্য সুস্থতর কোনো পৃথিবীর ছবি হয়ত আঁকেন না বিমল কর, কিন্তু তার অশক্ত শরীর এবং শক্তিশালী মন নিয়ে বেঁচে থাকা এক বিকল্প পথের সন্ধান দেয়।"[১০]

৬

নরনারীর তথাকথিত সাধারণ প্রেম বা স্বাভাবিক দাম্পত্যের ছবি *যদুবংশ*উপন্যাসে লেখক দেখাননি। যে কটি নারী চরিত্রকে এঁকেছেন, সময়ের ক্ষয় গ্রাস করেছে তাদেরও। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় সূর্যের দিদি বিজয়ার কথা— হিংসুটে-স্বার্থপর চরিত্র। ভাইকে আঘাত করতে গিয়ে বেলটের আঁকশি লেগে নিজের হাতই রক্তাক্ত হয়ে যায়, আবার সেই ভাইকে জুতো ছুঁড়ে মারতেও পিছপা হয় না। বিবাহ থেকে বৈধব্য— সবটুকু সময়েই সে থেকে গেছে বাপের বাড়িতে। যুবক ভাইয়ের সঙ্গে বিছানায় মারামারি খামচাখামচি করেছে, যে আচরণ একজন পরিণত বয়সের মহিলার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

এ হেন বিজয়ার গোপন প্রেম চলে ধনচন্দ্রের সঙ্গে— বেলফুলের মালা গেঁথে প্রেমিকের হাতে দেয়। তবে এর পিছনে শুধু প্রেম নেই, বিজয়ার স্বার্থও আছে। বাবার তৈরি করার নতুন বাড়িটি সে নিজের নামে করতে চায়, আর তাই সেক্ষেত্রে দালাল হিসেবে ব্যবহার করেছে ধনচন্দ্রকে। বিজয়ার এই স্বার্থপরতাই সূর্যকে আরও দূরে ঠেলে দেয়— দিদির গায়ে 'পচা বিড়ালের' গন্ধ পায়। তার সাজগোজেও শালীনতার অভাব চোখে পড়ে— 'জামার পাশ দিয়ে বিশ্রীভাবে নীচের জামার ফিতে বেরিয়ে রয়েছে। চল্লিশ বছর বয়সেও দিদি মেয়েদের হালকায়দার নীচের জামা পরে, কখনও কখনও দুপুরের দিকে জামার বদলে শুধু ওইটে পরে গায়ে আঁচল জড়িয়ে থাকে বলে সূর্যর বিশ্রী লাগে।... দু-দুটো ছেলে দিদির অথচ এসব শৌখিনতা ও নোংরামি দেখলে কে বলবে দিদির দুটো বাচ্চা।' বিজয়ার যৌনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অন্যভাবেও, তার অশ্লীল বইয়ের সংগ্রহ সম্পর্কে সচেতন সূর্য— 'এই সব বই বিজয়া অনেক দিন থেকে রেখে দিয়েছে। কী করে এসেছিল তা বিজয়াই জানে। কতভাবে জোগাড় করেছে; স্বামীকে দিয়েও আনাত।' নারীর যৌনপ্রবৃত্তিকে বিমল কর অস্বীকার করেননি। তাই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *দেওয়াল*-এও দেখা যায় মোহিতবাবুর বিধবা মেয়ে মিনাক্ষ্মী অকৃষ্ট হয়ে পড়ে দুর্বিনীত ও আত্মসুখপরায়ন বাসুর। যৌনতা নারী ও পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি, তবে বিজয়ার মধ্যে দিয়ে তা যেভাবে প্রকাশিত, সেখানে সংযমের অভাবকেই লেখক নির্দেশ করেছেন।

মালা চরিত্রের পটভূমি আলাদা হলেও সংযমের অভাব সেখানেও প্রকট। সূর্যর দূর সম্পর্কের মাসি— যদিও তাকে 'মালাদি' বলে ডাকে কিংবা সম্বোধন এড়িয়ে যায়। মালা চাকরি করে— একই বাড়িতে তার সঙ্গে থাকে অধ্যাপিকা জয়ন্তী। ঘরের বাইরে থেকে মালা ও জয়ন্তীর কথাবার্তা তাদের সমকামী সম্পর্কের শুধু ইঙ্গিত নয়, স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত উপন্যাসে সমকামিতা প্রসঙ্গ একালের পাঠককেও চমকিত করে। মনে রাখতে হবে তখনও সমকামকে কেন্দ্র করে *চাঁদের গায়ে চাঁদ*, *অনিকেত* বা তথ্য সমৃদ্ধ উপন্যাস *হলদে গোলাপ* কিংবা *মায়ামৃদঙ্গ* লেখা হয়নি। আবার এও মনে রাখা দরকার যীশুখ্রিস্ট্রের জন্মের দুশো বছর আগে লেসবস দ্বীপে জন্মেছিলেন গ্রীক কবি স্যাফো— যাঁর কবিতায় প্রথম 'সমকামিতার বার্তা' পাওয়া যায়। এছাড়াও আলোচ্য উপন্যাস প্রকাশের প্রায় দেড় দশক আগে বাংলা সাহিত্যেই পাওয়া যায় কমলকুমার মজুমদারের 'মল্লিকা বাহার' গল্প। সেখানে মল্লিকা এককালে শিশির বা অঞ্জনার ভাইয়ের প্রেমের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলও। কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার পর যখন নিজে থেকেও ব্রজ বা আনন্দর কাছে গেছে, মল্লিকার প্রতি পুরুষেরা বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। শেষ পর্যন্ত শোভনার স্পর্শেই 'দিব্য উষ্ণতা' পেয়েছিল মল্লিকা—

> "... শোভনা তার হাত দুটো ধরে টেনে আপনার কাছে আনল, কাঁচের চুড়ি ভেঙে টুকরো, ভাঙার শব্দ এতই অল্প যে লোক জড়ো করল না অথচ বিজ্ঞরা বলবেন প্রয়োজন ছিল। শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তার কণ্ঠে বিলম্বিত, চুম্বনে চুম্বনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে।"[১১]

শরীর নিয়ে খেলার পাশাপাশি সূক্ষ্ম মান-অভিমানও লেগে থাকে মালা ও জয়ন্তীর মধ্যে। দুই স্বাবলম্বী নারীর এই যৌথ যাপন সমাজের প্রতি এক তীব্র বিদ্রোহও বটে। আর সূর্য বা সূর্যের মতো ছেলেরা, যাদের কাছে নারীদেহ মাত্রি পুরুষের ভোগের সামগ্রী, তারা মেয়েদের এতখানি যৌন-স্বাধীনতা সহ্য করতে পারবে কেন! তাই স্বপ্নে দেখে— 'মালাদি আর জয়ন্তী জড়াজড়ি করে তার চারপাশে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে আর সূর্য হাতে তালি মারছে, ক্লাউনের পোশাক তার। সূর্য ছড়ির বেঁকানো মাথা দিয়ে একবার এর গলাটা টেনে এনে চুমু খাচ্ছে, একবার ওর গালে। ওরা সূর্যকে শুধু হাসাচ্ছে। অবশ্য শেষে সূর্য দেখেছিল মালাদি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে শরবত খেতে দিল, শরবতটা সূর্য খেল না, না খেয়ে মালাদির বুকে ঢেলে দিল, দিতে ব্লাউজ ভিজে গিয়ে ব্লটিং পেপারের মতো চুপসে গেল। ঠাস করে চড় মারল মালাদি, সঙ্গে সঙ্গে সূর্য মালাদির পেছনে এক লাথি।' মনে রাখতে হবে, বিমল কর, মালা বা জয়ন্তীর মধ্য দিয়ে গভীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব তুলে ধরতে চাননি; বিশেষত মালার আচার-আচরণ, ভাষা প্রয়োগ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও নানা ইঙ্গিতে তার চারিত্রিক বিকৃতিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই সাম্প্রতিক কালে লেখা হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের *প্রেম সমকামী*উপন্যাসের একেবারে শেষে লেখা—

> "হয়তো প্রত্যেক মানুষের মনেই সমকামিতা গোপনে লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে পেলে অন্তত কিছু সময়ের জন্য তা প্রকাশ পায়। প্রেম সমকামী।"[১২]

এই ভাবনার বিকাশ *যদুবংশ*-এ সম্ভব নয়। তাই বিজয়ার প্রতি যে ক্ষোভ সূর্য সরাসরি প্রকাশ করে মালার প্রতি অনুরূপ ভাবনাই স্বপ্নে ভিন্ন রূপ নিয়েছে।

২০১২ সালে *বহুমাত্রিক পত্রিকা*-য় প্রকাশিত একটি লেখায় উষসী চক্রবর্তী জানাচ্ছেন—

> "কোনও বিসমকামী মহিলা যদি একলা single থাকা পছন্দ করেন, তাহলেও কিন্তু মূলস্রোত সমাজ তার এই একলা বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে থাকে।... তাকে হয়ত আপাত শহুরে লোকজন সরাসরি কিছু বলে না, কিন্তু তার প্রতিও মূলস্রোত সমাজের একটা গেজ (Gaze) থাকে, অনুচ্চারিত প্রশ্ন থাকে যার মধ্যে সেও খুব একটা স্বস্তি বোধ করে না। অনেক সময় দেখা যায় যে মূলস্রোতের এই গেজ (Gaze) এর মধ্যে থাকতে থাকতে সে একলা বোধ করছে, নিজেকে 'মিসফিট' ভাবছে এবং মানসিক অবসাদের স্বীকার হচ্ছে।"[১৩]

এ প্রসঙ্গে নয়না ও তার পরিবারের উল্লেখ করা যায়। যদিও সেই অভাবের সংসারে 'মানসিক অবসাদে'র অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যের দয়ায় মাঠকোঠায় তিনবোনের জীবনযাপন খুব স্বাভাবিক ছিল না। এর প্রমাণও আছে। কিছুটা ভয় বা আতঙ্ক থেকেই নয়না, গণনাথকে নিজেদের সংসারে এনেছিল। অবশ্য নয়নার পূর্বজীবনও মসীলিপ্তই বলা যায়। রমাপদ চৌধুরীর কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে বিজয় কুমার দত্ত লিখেছেন—

> "বিমল কর-এর গল্প উপন্যাসের স্মরণীয় চরিত্রগুলির ভিত্তি হ'ল তাদের স্মৃতি। এবং কী বিচিত্র বর্ণনায়— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অতীত জীবন পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয় গোপন ব্যাধির ক্রমউন্মোচনের মতো, বহুকাল সঞ্চিত জ্বালা-ক্ষোভ-দুঃখের অধোস্বচ্ছ প্রকাশের মতো। স্মৃতি সতত সুখের— এই প্রবচনের মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো এই সব চরিত্রগুলি পাঠকের মস্তিষ্কে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে।"[১৪]

একথা ভীষণভাবে সত্যি নয়না প্রসঙ্গে। তার বিপত্নীক বাবা ছিল পঙ্গু, অথর্ব এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। সংসারের জোয়াল তার কাঁধে উঠেছে অনেক আগেই। 'সেলাই দিদি'র চাকরি নিয়ে বিয়ে করার সুযোগ বা পরিস্থিতি কোনোটাই তৈরি হয়নি— 'সেই দুঃসময়ে যে কীভাবে জল গড়িয়েছে ভাবলে ভয় করে! সে কী কাদাটে নোংরা জল, বাড়ি ভাড়া জোটেনি, দুবেলা দুমুঠো ডালভাতের সংস্থান করতে পারেনি নয়না, দু'বোনে ভাগাভাগি করে একই শাড়ি-সায়া পড়েছে, একটি চটি দু'বছর চালিয়েছে।' নানা প্রতিকূলতার মাঝেও মায়ের মতো বোনেদের আগলে রেখেছিল। সেজন্য অন্যের অনুগ্রহ নিতেও হয়েছে। পাল কোম্পানির মেজবাবু ছিলেন বিপত্নীক, সেই 'রোগা, রুক্ষ, বেপরোয়া, দাম্ভিক' মানুষটার নজর পড়েছিল 'নয়নার মত কালো-কুচ্ছিত সেলাই দিদি'র ওপর। নয়না অনুমান করেছিল, নিজের পরিবারের প্রতি মেজবাবুর ছিল 'গোপন আক্রোশ ও দুঃখ'। নয়নার সঙ্গে তার 'শোয়া-বসা'য় কোনও আড়াল রাখেননি মানুষটি— 'নয়নাকে মেজবাবু পালন করেছে'। সামাজিক কুৎসায় নয়নার চাকরি গেলেও নিরাশ্রয় হতে হয়নি তাদের। লোকালয়ের একপাশে, নতুন বসতির মাঠকোঠায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল তিনবোনের। মেজোবাবুর মৃত্যুর পরেও সেখানেই থেকে গেছে, শুধু কিছুটা নিরাপত্তা ও নির্ভরতার তাগিদে গণনাথকে রেখেছে নয়না।

সাধারণভাবে ভাইবোনদের জন্য বড়দিদির আত্মত্যাগ— বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে এমন চরিত্র বিরল নয়। আশাপূর্ণা দেবীর *বালুচরী*উপন্যাসের মন্দা কিংবা শক্তিপদ রাজগুরুর 'চেনামুখ' গল্পের নীতা (পরে চলচ্চিত্র ও উপন্যাস রূপে *মেঘে ঢাকা তারা*), দিব্যেন্দু পালিতের 'মাছ' গল্পের নিরুপমা অথবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মধুবন্তী' গল্পের জয়া— এদের থেকে বেশ কিছুটা দূরেই নয়নার অবস্থান। যেমন গণনাথের মেসের জগন্নাথের সঙ্গে নয়নার সম্পর্ক, চলত উপহার দেওয়া ও বিনিময়ে শীতের দুপুরে ফাঁকা মেসে নরনারীর মিলন। বিবাহের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও নয়না পেত পাঁচ টাকার নোট। কিন্তু মেসের ঠাকুরের মাধ্যমে লোক-জানাজানি হয়ে গেলে, সেই কেলেঙ্কারি থেকে নয়নাকে উদ্ধার করে গণনাথ— 'এসব লজ্জা-টজ্জা, বা সেই বয়সের বোকামি, ভুল, লোভ বেশিদিন থাকেনি। কারই বা থাকে। জীবনে আরও কত বড় ঘটনা ঘটল, কত রকমের মোড় খেল, কত দুঃখ আঘাত লজ্জা এল— জগন্নাথের কথা আর কেউ মনে রাখল না। নয়নাও নয়।' তবু সে রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ, সংসারের ভারে ক্লান্ত হয়; দুঃখ-কষ্টের মাঝে ভেবে ফেলে- 'যমুনা একটা ছেলেছোকরা জুটিয়ে চলে যাক'।

গণনাথের সঙ্গে তার সম্পর্ককে বোধহয় 'বন্ধুত্ব' শব্দেই প্রকাশ করা যায়। সেই সম্পর্কে কিন্তু কালিমা নেই। বিমল কর যে আদর্শকে গণনাথ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তার স্পর্শ পেয়েছিল নয়না। সেই মানুষটিকেই যখন যমুনা চরম বিপাকে ফেলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে নয়না। কৃপাময়ের কথায়— 'নয়না খুব কান্নাকাটি করছিল। দেখে যা কষ্ট হচ্ছিল...' আর গণনাথের শবদেহের সঙ্গে নয়নার যাত্রা— 'মিলের নোংরা কাপড়, আলুথালু চুল পিঠের পাশ দিয়ে আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে, হাতে একটা লণ্ঠন'। বিভ্রান্ত সময়ের মাঝেও কিছু মূল্যবোধ ধরা আছে হয়তো ওই আলোটুকুতেই।

উপন্যাসে নয়নার ছোটবোন রত্নাকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া না হলেও, মেজবোন যমুনার সামান্য উপস্থিতি উপন্যাসের পরিণতিকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সময়ের ব্যাধি অনেকাংশেই প্রকট হয়ে উঠেছে। বহু পুরুষ তার আশেপাশে ঘোরাফেরাও করে। 'ওয়াগান ব্রেকার' মোহিতের সঙ্গে যমুনা চলে যাবে, নয়না এমন আশাও মনে মনে পোষণ করেছিল। কিন্তু 'যমুয়া যায়নি, তার অনেক আশা। সে স্কুল থেকে পাশ করেছে, তার চেহারা ভাল, রং ফরসা, কায়স্থ ঘরের ভদ্র মেয়ে, সে আকাশের চাঁদ না হলেও অন্তত ভালো গাছের ফলটি পেড়ে খেতে চায়।' এই চরিত্রটি অনিবার্যভাবে মনে করায় *মেঘে ঢাকা তারা* উপন্যাসের নীতার বোন গীতাকে। রোজগেরে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সংসারের আয় যাবে কমে, এই আতঙ্কেই মা কদম্বিনী, বড় মেয়ে নীতার প্রেমিক সনতের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল মেজ মেয়ে গীতাকে। অবশ্য গীতার চরিত্রের মধ্যে ছিল তেমনই প্রবৃত্তি— সাজগোজ, অন্যজগতের নেশা, হাসি, স্পর্শ তার মনে 'আদিম তৃষা' জাগায়, আবার অনবধানে সনতের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—

> "গীতা মাথায় একরাশ চুল খুলে বিনুনি বাঁধছিল, গায়ের কাপড়চোপড়ও ঠিক নেই, মায়ের ডাকে দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল। এভাবে আদুর গায়ে সে সনতের সামনে বের হতে লজ্জা বোধ করে। লাল হয়ে যায় কপোল, আয়ত দু'চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে কি এক রঙিন আবেশের গাঢ় ছায়া।"[১৫]

সনৎও হারিয়ে যায় সেই আবেশে— নীতা তার কাছে 'কঠিন সংগ্রামমুখর জীবনের একটা বাহ্যিক রূপ মাত্র'; আর গীতা হল 'তৃপ্তির জন্য' 'শান্তির সন্ধান'। কিন্তু সনতকে পেয়েও গীতার 'নেশার আকর্ষণ কমে যায়'— মনে আসে 'স্তিমিত ভাটার টান'। দুজনের মাঝে অলক্ষ্যে 'নীতার নিঃশব্দ সঞ্চরণ' রয়ে যায়। সুখের সমস্ত উপকরণ পেয়েও সুখী হতে পারেনি আত্মসুখী-স্বার্থপর গীতা। *যদুবংশ*-এ যমুনাও আত্মসুখের টানে ঘর ছেড়েছে। যমুনা রোজগেরে মেয়ে, তবুও তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নয়না বোনের চারিত্রিক অসংযম বুঝতে পারে। উপন্যাসের প্রধান দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে আছে যে জন্মসুখী প্রদীপ, সেটিও যমুনা চুরি করেছে বলেই অনুমান করা যায়। কারণ প্রদীপ খুঁজে না পেয়ে সূর্যদের হাতে গণনাথ মার খাবার পরেই সে বাড়ি ছাড়ে। অথচ এই যমুনার সুস্থতার জন্য সবচেয়ে বেশি ভেবেছিল গণনাথ। কৃতজ্ঞতা বা সহানুভূতির ছিটেফোঁটাও যমুনার মধ্যে নেই।

৭

শুধু যুবসমাজের নয়, এক ভ্রষ্ট সমাজের সামগ্রিক ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। তাই সূর্যর বাবা কামাখ্যাবাবু, যিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বুললির বাবা পেশায় দারোগা— কাউকেই সৎ মানুষ বলা যায় না। অভয়ের বাবা সামাজিকভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে তার অবস্থান সঠিক নয়, একথা বলাই যায়। আর কৃপাময়ের পরিবারের ছবি তার চোখ দিয়েই পাঠক দেখে নেন— 'মেজকাকা হল স্বার্থপর, কৃপণ, আত্মসুখী। সেজকাকা কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারি পড়ল, পরে হাসপাতালের মেয়ে বিয়ে করল তারপর তার অংশের প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে কলকাতায় ডিসপেনসরি খুলে প্র্যাকটিস করতে লাগল।' ছোটকাকার চরিত্রও তথৈবচ। শুধু পরিবার নয়, চারুবাবুর কাছে অভয়ের জন্য একটা চাকরির কথা বলতে গিয়ে অপদস্ত হতে হয়েছিল চারবন্ধুকে। তাই তাদের আচরণে ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, টানাপোড়েনের সঙ্গে মিশে গেছে সমকালীন সমাজ-পরিবার-পরিস্থিতি। কারণ তারাও প্রাণময় হয়েই বাঁচিতে চেয়েছিল; যাদের প্রতিটি বাক্যে অশ্লীল শব্দ আর কুৎসিত ইঙ্গিতের প্রাচুর্য তাদের মধ্যেও ছিল সুস্থ সংস্কৃতি চেতনা— 'তাদের একবার কনসার্ট ক্লাব হয়েছিল, তাতে অভয় বাঁশি, কৃপাময় গিটার, বুললি অ্যাকরভিয়ান, আর সূর্য ম্যাকারস বাজাত। তাদের বাজনা শেখাত মোহনমাস্টার। মোহনমাস্টার কলকাতা চলে গেছে। তার আগেই কনসার্ট ক্লাব ভেঙে গিয়েছিল।... সেই গৎটাও মনে পড়ল বুললির; তারা বাজাত: 'সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব আমরা ভাঙি কূল...'। সুস্থ সংস্কৃতির ভেঙে পড়া ও বাংলা উপন্যাসে সেই প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "লক্ষহীন অসংগঠিত যুবসম্প্রদায় সাংস্কৃতিক কোন নেতৃত্ব পেল না কোথাও। যুদ্ধের সময় গণনাট্য সংঘ প্রমুখ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে লোক-জীবনের বেগবতী ধারাকে জানবার জন্য যে আগ্রহ সঞ্চারিত হল, অতি রাজনৈতিকতা ঘূর্নাবর্তে তা যেমন সংগঠনের দিক দিয়ে হারিয়ে গেল, তেমনি নানা দিক থেকে আহত লোক-জীবনের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ছন্দও ব্যহত হল গভীরভাবে। কলকাতায় পল্লী-সাংস্কৃতিক মেলা, রেডিওতে ভাটিয়ালির মতো কলকাতার পক্ষে মনোজ্ঞ হল মাত্র— আর কিছু নয়।... কোনোটাই রসপিপাসার সঙ্গে যুক্ত হল না।"[১৬]

পাঞ্চজন্য উপন্যাসের শেষে গজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীকৃষ্ণের যাদবকুল সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> "মহাসতী জননী গান্ধারীর অভিশাপ তাঁর বংশে সফল হয়েছে, কিন্তু সেইখানেই তার অবসান ঘটেনি। যুগ থেকে যুগান্তরে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে এই অভিশাপ এদেশের আকাশ-বাতাস-মৃত্তিকায় লেগে থাকবে, অনাগত বহুশত বৎসর ধরেই অভিসম্পাত বহন করতে হবে— এই দেশকে, এই জাতিকে। কুরুবংশনাশের জন্য যারা দায়ী তারা কেউ বেঁচে থাকবে না সত্য কথা— কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত থাকবে। পিতৃপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে উত্তরপুরুষদের— বংশানুক্রমে। তাঁর— তাঁদের পাপের ঋণ শত-শতাব্দীতেও শেষ হবে না।"[১৭]

বিমল কর অবশ্যই এই অভিশাপ, নিয়তি বা কর্মফলবাদে বিশ্বাসী হয়ে *যদুবংশ*উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু 'সময়ের ছিন্নমস্তা রূপ' যেন বার বার স্মরণ করায় সেই অমোঘ নিয়তিকে। আসলে লেখক সমাজের অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিনষ্টিকেই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে জীবন সম্বন্ধে তৈরি হয়েছে আগ্রহশূন্যতা। সেই প্রেক্ষাপটকে আশ্রয় করেই বিমল করের 'যদুবংশ'-এ বাস্তবতার পথ ধরে হতাশা-নৈরাশ্য, ক্ষোভ আর বিষণ্ণতার বোঝা নিয়ে চলে আসে ভ্রষ্ট সময়ের যুবসমাজ।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। পাঞ্চজন্য। মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৪, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪৫২।
২. বসু, রাজশেখর। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নব্যস কৃত মহাভারতের সারানুবাদ। এম.সি. সরকার, ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ৬৭৫-৬৭৬।
৩. দাস সুর, সুমনা । বিমল করের কথাসাহিত্য। এবং মুশায়েরা, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৩৮০।
৪. তদেব, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।
৫. দাশগুপ্ত, রাহুল। বাংলা উপন্যাসকোশ। প্রতিভাস, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৬।
৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে। দে'জ, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।
৭. দাস সুর, সুমনা। বিমল করের কথাসাহিত্য । প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১।
৮. দাশ, শচীন। সময়ের অসুখ ও বিমল করের দংশন' (প্রবন্ধ)। শুভশ্রী, ভালোবাসা: বাংলা কথাসাহিত্যে পর্ব ২, ১৪১৬, পৃ. ১০৯।
৯. মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী। 'এখনই এবং যদুবংশ: ভিন্ন নির্মাণে যুবসমাজের অন্তর্দহন' (প্রবন্ধ)। উজাগর। রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, ১৪২০, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।
১০. দাস সুর, সুমনা । বিমল করের কথাসাহিত্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
১১. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র। আনন্দ, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৬৫।
১২. দাশগুপ্ত, হিমাদ্রিকিশোর। প্রেম সমকামী। প্রিয়া বুক হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৩৫।
১৩. চক্রবর্তী, উষসী। মেয়েঘেঁষা লেখারা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৫৮।
১৪. দত্ত, বিজয়কুমার। 'আর্ত হৃদয়ের রূপকার: বিমল কর রমাপদ চৌধুরী' (প্রবন্ধ)। উজাগর। রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
১৫. রাজগুরু, শক্তিপদ। মেঘে ঢাকা তারা। অমৃতধারা, ১৯৬২, কলকাতা, পৃ. ৪২।
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। নতুন সাহিত্য ভবন, ১৩৬৮, কলকাতা, পৃ. ৩৪৫।
১৭. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। পাঞ্চজন্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩।

আকর গ্রন্থ:

১. কর, বিমল।যদুবংশ । উপন্যাস সমগ্র ৩ । আনন্দ, ২০০০, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. কর, বিমল কর। দেওয়াল। আনন্দ, ১৯৮৯, কলকাতা।
২. বন্দ্যোপাধ্যায় , শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যসের ধারা। মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৯৮৪, কলকাতা।
৩. দত্ত, সন্দীপ। বাংলা কবিতার কালপঞ্জি (১৯২৭-১৯৮৯)। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, ১৯৯৩, কলকাতা।
৪. মিত্র, সরোজমোহন। বাংলার গল্প ও ছোটগল্প । প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১১, কলকাতা।